ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য: স্থিতিশীলতা

সাইয়্যেদ কুতুব

[??????????? (worldview) : মূল আরবিতে সাইয়্যিদ কুতুব তাসাওউর (????????????????????????????????????) বযবহার করেছেন। সাধারণত তাসাওউর শবেদর র্অথ করা হয় 'concept'/'conception' বা ধারণ হিসেবে। তবে লেখক এ শবদটিকে আরও বযাপক র্অথে বযবহার করেছেন।
তিনি ইসলামি তাসাওউর বলতে বুঝিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া অস্তিত্বের সামগ্রিক বযাখযাকে। যে বযাখযার মধেয স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ, মানুষের উৎস ও ভূমিকা, জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, সমাজ, শাসন—সবই অর্ন্তভুক্ত।
লেখক যে র্অথে তাসাওউর শবদটি বযবহার করেছেন র্অথের দিক থেকে 'ধারণা', 'দৃষ্টিভঙ্গি' ইৎযাদি শবেদর তুলনায় ইংরেজি ওর্য়াল্ডভিউ (worldview) শবদটি তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যর্পূণ। দুঃখজনকভাবে ওর্য়াল্ডভিউ শবেদর যেসব বাংলা করা হয়েছে, সেগুলো হয় অৎযন্ত অপ্রচলিত হবার কারণে অচেনা প্রায়, অথবা মূলভাব প্রকাশে বর্যথ কিংবা দুটোই। তাই অনুবাদে 'ওর্য়াল্ডভিউ' শবদটিই বযবহার করা হয়েছে।
সংকেষপে ওর্য়াল্ডভিউ হলো :
স্রষ্টা, মহাবিশ্ব, মানুষ, ইতিহাস, জীবনমৃৎযু, জ্ঞানসহ নানা বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের সমষ্টি। এটি চিন্তার ওই কাঠামো, যার সাপেকেষ, যার মাধযমে এবং যার ভেতরে মানুষ বাস্তবতাকে বোঝার ও বযাখযা করার চেষ্টা করে। ওর্য়াল্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা, যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি। প্রৎযেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রৎযেকের একটা ওর্য়াল্ডভিউ থাকে৷ হয়তো তারা সেটাকে 'ওর্য়াল্ডভিউ'-এর মতো গালভরা কোনো শবদ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শবেদর পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধেযই থাকে।]

> কাজেই দ্বীনের প্রতি আপনার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করুন একনিষ্ঠভাবে। এটাই আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম), যার ওপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।
>
> (সূরা রূম, ৩০ : ৩০)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানবীয় চিন্তার ফসল নয়। কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বা নির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য তৈরি

হয়নি। দুনিয়াবি কোনো লক্ষ্যে এর উদ্ভব হয়নি, ইসলাম প্রযোজ্য সর্বাবস্থায় এবং সর্ব যুগে।। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা, মানবজাতির জন্য নিয়ামাত ও রাহমাহ।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কিছু চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা আছে। সময়ের সাথে সাথে বাহ্যিক ও দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তন হয়। সমাজের রূপ ও ধরন বদলায়। কিন্তু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মৌলিক 'উপাদান' এবং 'মূল্যবোধ'গুলো বদলায় না। এগুলো স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। এই ওয়ার্ল্ডভিউ একটি নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথের মতো। ইসলামি সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তন হতে হবে এই চিরন্তন বাস্তবতাগুলোর কাঠামোর ভেতরে। এর অর্থ চিন্তা ও কাজের স্থবিরতা নয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সমাজের পরিবর্তন ও গতিশীলতাকে কেবল বৈধতা দেয় না, অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহিতও করে। তবে শর্ত হলো এই পরিবর্তন হতে হবে ইসলামের কাঠামো এবং ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কক্ষপথের ভেতরে। একটি কেন্দ্রের চারপাশে, নির্দিষ্ট অক্ষ ও কক্ষপথের ভেতরে গতিশীলতার এই বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহর সব সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান, একটু চিন্তা করলে যে কেউ এ বাস্তবতা বুঝতে পারবেন। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

বস্তু—তা অণু হোক, অণুকে ভাঙার পর নিঃসৃত শক্তি হোক কিংবা অন্য কিছু, সবকিছুরই একটি স্থিতিশীল নির্যাস আছে। কিন্তু একই সাথে বস্তু সদা গতিময়, পরিবর্তনশীল। অণুতে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে। প্রত্যেক গ্রহের নির্দিষ্ট কক্ষপথ থাকে, নির্দিষ্ট গতিপথ থাকে প্রত্যেক নক্ষত্রের। সবকিছু এক নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে গতিশীল।

আমরা জানি মহান আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ভেতর তাঁর পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করেছিলেন।[1] মানুষের এই 'মানবতা', যা তাকে অন্য সব প্রাণীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, একটি স্থায়ী বাস্তবতা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 'মানবতা' বা 'মানবপ্রকৃতি' বিদ্যমান। জীবনে মানুষ বিভিন্ন পর্যায় ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। ভ্রূণ থেকে শুরু করার পর এক পর্যায়ে মানুষ এসে পৌঁছায় বার্ধক্যে। বিভিন্ন সামাজিক পর্যায়ও অতিক্রম করে সে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ সম্মানিত অথবা অপমানিত হয় মানবতার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের সাথে তার নৈকট্য অথবা দূরত্বের ভিত্তিতে। জীবনের পরিবর্তনগুলো তাকে তার স্থায়ী ও স্থিতিশীল মানবপ্রকৃতির নির্যাসের বাইরে নিয়ে যায় না। সহজাত কামনা, ক্ষমতা, সামর্থ্য সব অবস্থাতেই তার মধ্যে থাকে।

মানুষের মধ্যে তার পরিবেশকে বদলানোর, একে আরও উন্নত করার প্রবণতা কাজ করে। এটিও একটি স্থায়ী বাস্তবতা। এই প্রবণতার সম্পর্ক আছে মহাবিশ্বের মৌলিক গতিশীলতার সাথে। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে মানুষকে যে অবস্থান দেওয়া হয়েছে, এই প্রবণতা তারই ফসল। প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কাজে লাগাতে হয় সেগুলোকে। তাই এই প্রবণতা গেঁথে আছে মানুষের প্রকৃতির গভীরে। তবে স্থান-কাল ভেদে এই প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য হয়।

কাজেই মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন দিকে নির্দিষ্ট অক্ষের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথের মধ্যে পরিবর্তনের এই বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া যায়। এটি ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়েরও একটি বৈশিষ্ট্য। আমরা এখানে সংক্ষেপে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মৌলিক উপাদান ও মূল্যবোধের কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। এই মৌলিক উপাদান ও মূল্যবোধগুলোকে ইসলামি জীবনব্যবস্থার অক্ষ ধরা যেতে পারে।

১) মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। এ সবকিছুর আছে সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় অর্থ। এখানে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর চিরস্থায়ী হওয়া, তাঁর একত্ব, সৃষ্টির ওপর তাঁর ক্ষমতা ও রাজত্ব, তাঁর সার্বভৌমত্বসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এই স্থায়ী বাস্তবতাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ হলেন ইসলামি ব্যবস্থা ও ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কেন্দ্র।

২) আরেকটি স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় সত্য হলো—মহাবিশ্ব এবং এর মাঝে থাকা সব বস্তু ও প্রাণী মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তিনিই এগুলোর উদ্ভাবক। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন বলেই এ সবকিছু অস্তিত্বে এসেছে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে আর কারও, আর কোনোকিছুর অংশীদারত্ব নেই। মহান আল্লাহর কোনো শরীক নেই মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো অংশের নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনাতেও। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলোতে একক।

৩) ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্য। বস্তু, প্রাণী এবং নবি-রাসূলগণসহ সব মানুষ মহান আল্লাহর দাস। মালিক তিনি একাই। মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সবাই এবং সবকিছু তাঁর গোলাম। মহান আল্লাহর সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক দাসত্বের।

৪) ঈমান ছাড়া কাজ অর্থহীন, ঠিক যেমন আমল ছাড়া ঈমান হয়ে পড়ে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ। নেক আমলের শর্ত হলো আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, কিয়ামাত এবং তাকদীরে বিশ্বাস। কোনো কাজ মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবার শর্ত ঈমান। ঈমান ছাড়া কাজ অর্থহীন, মূল্যহীন, প্রত্যাখ্যাত।

৫) মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো বিশ্বাস কিংবা জীবনব্যবস্থা আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। ইসলামের অর্থ এক আল্লাহর ইবাদাত করা, মহান আল্লাহর পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা, সন্তুষ্ট মনে তাঁর হুকুমের সামনে নিজেকে সমর্পণ করা এবং মানবজীবনের সব দিক পরিচালিত করা তাঁর নির্ধারিত শারীআ অনুযায়ী। মহান আল্লাহ ইসলাম এবং শুধু ইসলামকেই মানবজাতির জন্য নির্ধারণ করেছেন।

৬) পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কারণ তাকে পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী ও এর মাঝে যা কিছু আছে সেগুলো মানুষের অনুগত করা হয়েছে।[2] পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যার বস্তুগত মূল্য মানুষের চেয়ে বেশি। এমন কিছু নেই, যার জন্য মানুষকে বিসর্জন দেওয়া যায়।

৭) সব মানুষ একই উৎস থেকে এসেছে, এ দিক থেকে সব মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে সম্মান ও অবস্থানের পার্থক্য হয় ঈমান, তাকওয়া এবং নেক আমলের ভিত্তিতে। সম্পদ, জাতীয়তা, শ্রেণি, সামাজিক অবস্থান, বর্ণ কিংবা জন্মস্থানের মতো বিষয়গুলোর কারণে কেউ কারও ওপর প্রাধান্য পাবে না।

৮) মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর ইবাদাত করা। ইবাদাত করার অর্থ মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। পূর্ণ আনুগত্যের শর্তের মধ্যে আছে জীবনের ছোট-বড় সব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ এবং কেবল তাঁরই নির্দেশ মেনে চলা। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি হৃদস্পন্দন তাঁর ভালোবাসায়, তাঁরই জন্য নিবেদনের চেষ্টা করা।

৯) মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হলো ঈমান এবং আল্লাহর নির্ধারিত পথের অনুসরণ। জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয়, বর্ণ পরিচয়, জাতীয়তা, আঞ্চলিক পরিচয়, শ্রেণি পরিচয়, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিংবা অন্য কোনো দুনিয়াবি উদ্দেশ্য—সম্পর্কের ভিত্তি নয়।

১০) দুনিয়ার জীবন হলো পরীক্ষা। এ পরীক্ষা বিশ্বাস ও আমলের। আখিরাতের জীবন হলো হিসাব ও প্রতিদানের। দুনিয়াতে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব রাখা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে প্রতিটি কাজ, প্রতিটি উচ্চারণ, ভালো-মন্দ যেকোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রতিক্রিয়া। আর এ সবকিছুর হিসেব নিয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন মহান আল্লাহ, যিনি সর্বোচ্চ বিচারক।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের এই সবগুলো উপাদান ও মূল্যবোধ স্থায়ী। এগুলোতে কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। মানুষের জীবন ও জীবনধারা এই অপরিবর্তনীয় কাঠামোর সাপেক্ষে গতিশীল থাকবে। এই স্থায়ী উপাদান ও মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে ইসলামি সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, সমাজের সব ধরনের সম্পর্কের মধ্যে, জীবনকে সংগঠিত করার সব প্রচেষ্টায়। এই মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে, সব ধরনের পরিবেশে, সব ধরনের প্রেক্ষাপটে।

একটি সমাজ যত বিস্তৃত হতে থাকে, এই মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ ও উপায় তত বাড়তে থাকে। মানবীয় জ্ঞানের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয়, তত বাড়ে ইসলামের স্থায়ীয় মূল্যবোধগুলোর প্রকাশভঙ্গি। নতুন নতুন প্রকাশভঙ্গি তৈরি হয়, কিন্তু সেগুলোকে চালিত করে স্থায়ী মূলনীতিগুলো। মূলনীতিগুলো অপরিবর্তিত থাকে।

বিষয়টি বোঝার জন্য একটি স্থায়ী বাস্তবতার দিকে তাকানো যাক : মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর খলীফা।

এই স্থায়ী বাস্তবতার প্রকাশ ও প্রয়োগ হতে পারে নানাভাবে। মানুষ যখন খাদ্যের জন্য ক্ষেতে চাষ করে, যখন অণুকে ভেঙে তার ভেতরে উঁকি দেয়;। যখন মানুষ মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠায় অনুসন্ধানের জন্য, তখন এই স্থায়ী বাস্তবতা প্রকাশ পায়। এই সবগুলো কাজ এবং এমন যা কিছু ভবিষ্যতে মানুষ করবে, সবই মহান আল্লাহর খলীফা হিসেবে মানুষের ভূমিকার প্রকাশভঙ্গি। এই প্রকাশভঙ্গির ধরন ও ব্যাপ্তি বদলাবে, কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি থাকবে অপরিবর্তিত। এই স্থায়ী বাস্তবতার দাবি হলো, কোনো মানুষের প্রাপ্য সম্মান এবং আল্লাহর দেওয়া অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। মানুষের সম্মান ও মূল্য বিসর্জন দেওয়া হবে না বস্তুগত কোনো স্বার্থের জন্য।

আরেকটি স্থায়ী বাস্তবতার কথা চিন্তা করা যাক : মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর ইবাদাত করা।

এই স্থায়ী বাস্তবতা প্রকাশ পেতে পারে মানুষের সব কাজের মাধ্যমে। জীবনের সব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা, শারীআ অনুযায়ী কাজ করা ইবাদাত। এমন ক্ষেত্র আর উপলক্ষ অনেক। সময়ের সাথে সাথে চাহিদা অনুযায়ী মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্বের ব্যাপ্তি বাড়তে পারে। কিন্তু মানুষের মূল উদ্দেশ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না। প্রকাশভঙ্গি আর প্রয়োগের পথ, সংখ্যা ও ব্যাপ্তি বদলাতে পারে। কিন্তু মূল্যবোধ ও উপাদানগুলো অপরিবর্তিত থাকবে। জীবনের সব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন না করা হলো এই স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় সত্যের লঙ্ঘন। এটি মানব অস্তিত্বের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন। এমন ব্যক্তির কাজ মহান আল্লাহর সামনে এবং মুমিনদের চোখে অকার্যকর এবং বাতিল হয়ে যায়।

স্থায়িত্বের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে মানবজাতির উন্নয়নের প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খলভাবে আগায়। এই প্রক্রিয়া এলোমেলো, অস্থির কিংবা নৈরাজপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় না, যেমনটা ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে হয়েছে। স্রষ্টায় বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে ইউরোপ পথ হারিয়েছে। দূর থেকে জাঁকজমক আর চাকচিক্যময় দেখালেও;- ইউরোপের ভেতরে লুকিয়ে আছে বিভ্রান্তি, পরাজয় আর হতাশা।

স্থায়ী মূল্যবোধের আরেকটি ইতিবাচক দিক হলো—এই অপরিবর্তনীয় মাপকাঠির আলোকে মানুষ নিজের চিন্তা, অনুভূতি, ধারণা এবং পরিবেশ-প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনকে বিচার করতে পারে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ধ্রুব মানদণ্ডে মেপে সে বুঝতে পারে, সত্য আর কল্যাণের পথের কতটা কাছে কিংবা দূরে তার অবস্থান। এতে করে সে নিরাপদ সীমানার ভেতরে থাকার সুযোগ পায়, যা খেয়ালখুশি আর অনুমানের মরুপ্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করে। সে এগিয়ে যেতে পারে স্থিরতারা আর সুনিশ্চিত মাইলফলক সামনে রেখে।

স্থায়ী মাপকাঠি আবেগ আর কামনাবাসনার তোড়ে ভেসে না গিয়ে নিজের চিন্তাকে বিন্যস্ত করার সুযোগ দেয়। সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ছাড়া কোনোকিছুর মূল্যায়ন করা যায় না। মানুষের চিন্তা এবং প্রেক্ষাপট ক্রমাগত বদলায়। স্থান, কাল, প্রেক্ষাপট আর চিন্তার পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়, তাহলে আদৌ কি কোনো নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা ধরে রাখা সম্ভব? মানবজীবনের নিরাপত্তা এবং মানবমনের সুস্থতার স্বার্থেই চিন্তা ও কাজকে সুনির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে তৈরি করা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কক্ষপথে রাখা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ এই অক্ষকে করেছেন সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়। অণু থেকে শুরু করে ছায়াপথ, এভাবেই সাজানো হয়েছে সমগ্র মহাবিশ্ব।

সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মাপকাঠির গুরুত্ব আজকের মতো আর কখনো এত তীব্র ছিল না। আধুনিক মানুষ সব ধরনের নীতি ত্যাগ করেছে। কক্ষচ্যুত হয়ে আজ মানবজাতি এলোমেলো ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদের অবস্থা ওই গ্রহের মতো, যে ছিটকে বেরিয়ে গেছে নিজের কক্ষপথ থেকে। তীব্রগতিতে সে ছুটে যাচ্ছে অন্য কোনো গ্রহ কিংবা নক্ষত্রের সাথে ভয়ংকর সংঘর্ষের দিকে। যে সংঘর্ষে সে নিজে তো ধ্বংস হবেই, সেই সাথে ধ্বংস করবে তার গতিপথে থাকা সবকিছু।

> সত্য যদি তাদের ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার অনুসারী হতো, তাহলে আকাশ পৃথিবী আর এ দুয়ের মাঝে যা আছে, সব লন্ডভন্ড হয়ে যেত। (তাদের কামনাবাসনার) বিপরীতে আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের জন্য উপদেশবাণী। কিন্তু তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৭১)

মানবজাতি এক তীব্র উন্মাদনার কবজায় আটকা পড়ে গেছে। এই উন্মাদনা থেকে মুক্ত মানুষেরাই সত্যিকার অর্থে আলোকিত এবং প্রাজ্ঞ। মানবজাতির আজকে শোচনীয় অবস্থা, মিথ্যে ব্যবস্থা আর মতাদর্শিক ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকালে বোঝা যায় নোঙর ছিঁড়ে গেছে। নীতি, নৈতিকতা, অভ্যাস, আচরণ, সংস্কার ও সংস্কৃতি—নোঙর ছিঁড়ে গেছে সবকিছুর। মানুষ উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছে, উন্মাদের মতো নিজের পোশাক টেনে টেনে ছিঁড়ছে, মোহগ্রস্তের মতো ছুটছে এক মরীচিকা থেকে আরেক মরীচিকার দিকে। মানুষ আজ ওই একই উদাসীনতার সাথে নিজেদের চিন্তা আর বিশ্বাসকে পালটে ফেলে, যেভাবে হালফ্যাশনের সাথে তাল মিলিয়ে তারা পোশাক পালটায়। মানুষ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, চন্দ্রাহতের মতো হাসছে, শিকারের মতো ছুটছে, মাতালের মতো টলছে, একবারও না ভেবে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে হাতে থাকা অমূল্য সম্পদ, আর পরম আগ্রহ ভরে হাতে তুলে নিচ্ছে বালি, কাদা, পাথর আর আবর্জনা। সত্যিকারের আলোকিত মানুষেরা এই বাস্তবতা দেখতে পায়।

কোটি কোটি মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, আরও কোটি কোটি মানুষকে বানানো হয়েছে উৎপাদনের যন্ত্র। সমাজের সব নিয়ম বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। বিসর্জন দেওয়া হয়েছে নান্দনিকতা, সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকতা আর মূল্যবোধ। কেন? যাতে অল্প কিছু মানুষ—সুদখোর, বিনোদন আর সস্তা সুখের ফেরিওয়ালা এবং ক্ষমতার সওদাগরেরা আরও ধনী হতে পারে।

মানুষের চোখের দিকে তাকান। তাদের পোশাক, আচরণ আর চলাফেরার দিকে তাকান। উঁকি দিয়ে দেখুন তাদের চিন্তায়। একটু পর্যবেক্ষণ করুন তাদের মতামত আর কামনাবাসনাগুলো। দেখবেন মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত। কোনো শিকারি যেন তাকে খুঁজে ফিরছে। যেন মানুষ প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে নিরন্তর ছুটছে। তার থামার সময় নেই। ভালো-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ, সত্যমিথ্যা নিয়ে ভাবার সময় নেই। মানুষ ছুটছে। ক্ষুধার্ত, উদ্বিগ্ন, বিহ্বল মানুষ পালিয়ে বেড়াচ্ছে নিজেই নিজের কাছ থেকে। আঁকড়ে ধরার মতো মজবুত কোনো খুঁটি পাচ্ছে না, কোনো কেন্দ্র আর কক্ষপথ পাচ্ছে না সে। মহাবিশ্বের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, উদ্‌ভ্রান্ত ও শোচনীয় এই অবস্থায় মানুষের আত্মা বাঁচতে পারে না। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তা। সে নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়; উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন, বিশ্রাম ছাড়া, শান্তি ছাড়া।

আর মুমূর্ষু মানবজাতির এই শোচনীয় অবস্থা দেখে উপভোগ করে এক দল শকুন; +যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য অন্যের কষ্ট, দুর্দশা আর বিভ্রান্তি থেকে মুনাফা করা। এই শকুনের দলে আছে সুদখোর, রাজনীতিবিদ, বিনোদনের ফেরিওয়ালা আর ক্ষমতার আড়ালে থাকা শক্তিধরেরা। মানবজাতি যখনই নিজের ভুল বুঝতে শুরু করে, উদ্‌ভ্রান্ত পথচলা থামিয়ে কোনো অক্ষ আর কক্ষপথ খুঁজে নিতে চায়, শকুনের দল তখনই আবার মানুষকে ঠেলে দেয় উন্মাদনা আর বিভ্রান্তির গহ্বরে। তারা প্রগতি আর মুক্তির স্লোগান তোলে, সব সীমানা আর নিয়মনীতিকে ছাড়িয়ে যাবার কথা বলে। তারপর দুহাতে ধাক্কা দিয়ে মানুষকে ঠেলে ফেলে দেয় নৈরাজ্য আর অরাজকতার ঘূর্ণিপাকে। কত বড় অপরাধ! কী জঘন্য, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ!

নিরন্তর প্রগতি বা মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ক্রমাগত অগ্রগতির ধারণা বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। এই ধারণা সাংঘর্ষিক মহাবিশ্ব আর প্রকৃতির মৌলিক ভিত্তির সাথে। অবিরাম প্রগতি অবধারিতভাবে মানবসমাজে এমন সব বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়, যার কবল থেকে রেহাই পায় না কোনোকিছুই। প্রগতির স্লোগানে যেকোনো ওয়ার্ল্ডভিউ, মূল্যবোধ কিংবা জীবনব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়া যায়। প্রগতির এই ধারণা বলে—যা কিছু নতুন, তা অবধারিতভাবে পুরনো সবকিছুর চেয়ে উত্তম। এই ধারণা হাস্যকর এবং অযৌক্তিক। ওয়ার্ল্ডভিউ, মূল্যবোধ বা জীবনব্যবস্থা যাচাইয়ে এই মাপকাঠি উপযুক্ত নয়। বিচার করা উচিত ওয়ার্ল্ডভিউ বা জীবনব্যবস্থার উপাদানগুলোর আলোকে। সেগুলো কোন সময়ে এসেছে, তার ভিত্তিতে নয়।

চার্চের জুলুম ও বিকৃত শিক্ষার কারণে স্থিতিশীলতার যেকোনো ধারণা প্রত্যাখ্যানের দিকে ইউরোপীয় চিন্তার একটা ঝোঁক তৈরি হয়। স্থায়ী, মৌলিক বিশ্বাস আর বিধিবিধান থেকে ইউরোপ মুক্ত হতে চাচ্ছিল। তাই স্থিতিশীলতার বদলে তারা গ্রহণ করল ব্যাপক, অবাধ প্রগতির ধারণা,+ যার আওতায় পড়ল ধর্মীয় বিশ্বাস ও আইনও। চার্চের জুলুম আর বন্দি থেকে বাঁচতে গিয়ে এভাবে ইউরোপীয় চিন্তা চলে গেল আরেক প্রান্তিকতায়। ‘প্রগতি’ আর ‘পরিবর্তনের’ সত্যায়ন করতে গিয়ে অস্বীকার করে বসল চূড়ান্ত ও পরম সত্যের অস্তিত্বকেই।

ইউরোপীয় চিন্তা কোন পথে এগিয়েছে, আগের অধ্যায়ে তা নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। নিঃসন্দেহে তাদের পথ ভুল

ছিল। তবে এটিও বোঝা জরুরি যে, তাদের কাজগুলো ছিল প্রতিক্রিয়া। চার্চের প্রচারিত বিকৃত শিক্ষা থেকে পালাতে গিয়ে আরেক অন্ধকার গোলকধাঁধায় আটকা পড়ে গেছে তারা। শুরু থেকেই চার্চের প্রচারিত আকীদাতে ছিল পৌত্তলিকতা আর পৌরাণিকতার মিশেল। দুর্নীতিবাজ, স্বৈরতান্ত্রিক চার্চ 'স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়' বিশ্বাসের নামে বিভিন্ন অর্থহীন ধ্যানধারণা, কুসংস্কার আর নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছিল। ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল এই বাস্তবতাগুলোর। তাই ইউরোপীয় চিন্তার ঐতিহাসিক গতিপথের মূল্যায়নের সময় খুব বেশি কঠোর হওয়া সম্ভবত উচিত হবে না।

পশ্চিমা চিন্তাকে দোষারোপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আগ্রহ প্রগতি নিয়ে, তাদের বিশ্বাস নিয়ে। ইউরোপ পরম, নিরবচ্ছিন্ন, অবাধ প্রগতির কথা বলে;+ যে প্রগতি স্থায়ী কোনো নীতি, মূল্যবোধ বা সত্য দ্বারা আবদ্ধ নয়। প্রগতির এই ধারণাকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করার একটা শক্ত প্রবণতা ইউরোপীয় চিন্তায় দেখা যায়। এই প্রবণতার উৎস কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। এই প্রবণতা যৌক্তিক নয়। বরং এই প্রবণতা কামনাবাসনাপূর্ণ একগুঁয়েমির ইঙ্গিত দেয়, যার জন্ম হয়েছে যেকোনো মূল্যে চার্চের জুলুম থেকে বাঁচার বেপরোয়া আকাঙ্ক্ষা থেকে।

ইউরোপীয় চিন্তার ভুলগুলো কী ছিল, কোথায় কোথায় তারা ভুল দিকে মোড় নিয়েছে, তা আমাদের জানতে হবে। চার্চের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইউরোপীয় চিন্তা সব স্থায়ী নীতি ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল। গ্রহণ করে নিল নিরন্তর পরিবর্তন আর অবিরাম প্রগতির ধারণা। ধরে নিল, মহাবিশ্বে কোনোকিছুই স্থির নয়, কোনোকিছুই স্থায়ীভাবে সঠিক নয়, পরম সত্য নয় কোনোকিছুই। এই অবস্থান ছিল চার্চের জুলুমের বিপরীতে চরমপন্থী এক প্রতিক্রিয়া।

তারপর চার্লস ডারউইন বিবর্তনের তত্ত্ব হাজির করলেন। জীবনের বাহ্যিক কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করলেও, জীবনের উৎপত্তির প্রশ্নে গভীর কোনো আলোচনা ডারউইন পেশ করেননি। প্রাণের রহস্য কিংবা পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি ডারউইন। কীভাবে, কার ইচ্ছায় জীবনের শুরু হলো- এ প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়া যায় না ডারউইনের কাছে। ডারউইন-তত্ত্বের শেকড় ধরে টান দেওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে।[3] তবে তর্কের খাতিরে যদি তা সঠিক ধরেও নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রেও সব তথ্য-প্রমাণ এমন এক সত্তার ইঙ্গিত দেয়, যার নির্ধারণ করা পথে বিবর্তন অগ্রসর হয়েছে। বিবর্তনকে যদি প্রকৃতির মাঝে কার্যকর একটি বিধান বা প্রক্রিয়া হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হবে, প্রকৃতির সব প্রক্রিয়াই একটি নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে অগ্রসর হয়। যেখানে দৈবচয়ন বা আকস্মিকতার সুযোগ নেই।

ডারউইনের চিন্তা 'তথ্য-উপাত্ত' বা 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' দ্বারা চালিত হয়নি। ডারউইন সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন স্রষ্টাকে এই আলোচনার বাইরে রাখার। প্রাণের অস্তিত্ব অর্থ হলো এর পেছনে একজন নির্মাতা থাকা—যেকোনো যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক মন তাৎক্ষণিকভাবে এ সত্য ধরতে পারে। এ উপলব্ধিকে আরও দৃঢ় করে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ। এতে করে এ প্রক্রিয়ার পেছনে প্রাণের নির্মাতার সুর্নিদিষ্ট ইচ্ছা ও পরিকল্পনার বিষয়টিও বোঝা যায়। বোঝা যায়, এই নির্মাতা জানতেন-তিনি কী করছেন এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে সক্ষম।

কিন্তু এ সত্যকে ডারউইন স্বীকার করতে পারলেন না। অন্যান্য ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও গবেষকদের মতো তিনিও চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং চার্চের প্রচারিত ঈশ্বরের কবল থেকে পালাতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডারউইন নিয়ে এআসলেন 'প্রকৃতির' কথা। প্রকৃতির নাকি সীমাহীন ক্ষমতা। তারপর ডারউইন দেখানোর চেষ্টা করলেন— কোনোকিছুই স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় নয়। লক্ষ করুন, এসব ব্যাখ্যা আর গবেষণা কিন্তু ওই সব প্রাণের ব্যাপারে দেওয়া হচ্ছে, যার উদ্ভব ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এই ব্যাখ্যাগুলোকে কোনোভাবেই সর্বজনীনভাবে সবকিছুর ওপর প্রয়োগ করা যায় না।[4]

যেসব বস্তুবাদী দর্শন 'নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথ এর ধারণার বিরোধিতা করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে চরম অবস্থান হলো মার্ক্সবাদের। কারণ সত্যকে স্বীকার করে নিলে মার্ক্সবাদের একটি আদর্শিক ভিত্তি ভেঙে পড়বে এবং তাদের প্রগতির দাবি নাকচ হয়ে যাবে। স্থায়ী মূল্যবোধ ও বিধানের বদলে মার্ক্সবাদীরা তাই অবিরাম 'প্রগতি'তে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি কী? The New Islamic Thought and Its Connection with Modern Imperialism, বইতে মুহাম্মাদ আল-বাহি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

ফিকটে দ্বন্দ্বের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। এই নীতি বলে—সব বস্তু নিজের মধ্যে তার বিপরীতকে ধারণ করে। কাজেই সবকিছু একসময় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে। ফিকটে ও হেগেলের মতো জার্মান দার্শনিকদের উপস্থাপন করা পক্ষ-বিপক্ষ বা তত্ত্ব-প্রতিতত্ত্বের দ্বান্দ্বিক (dialectical) যুক্তি মার্ক্সও গ্রহণ করল। তবে মার্ক্স একে প্রয়োগ করল কিছুটা আলাদাভাবে। এই নীতি সে প্রয়োগ করল 'অর্থনীতি' এবং মানব ইতিহাসের ভূমিকার ওপর।

হেগেলিয়ান ডায়ালেকটিক অনুযায়ী মার্ক্সবাদ বলে, সবকিছু নিজের মধ্যে পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তি ধারণ করে—তত্ত্ব ও প্রতিতত্ত্ব (thesis and antithesis)। এই দুই বিপরীত একে অপরকে ধ্বংস করে ফেলে। তাদের পারস্পরিক ধ্বংসের মধ্য থেকে জন্ম নেয় এক নতুন অবস্থা; 'সমন্বয়' (synthesis)। এই 'সমন্বয়' নিজের মধ্যে তত্ত্ব ও প্রতিতত্ত্ব, দুটোকেই একত্রিত করে। তারপর এই সমন্বয় নতুন তত্ত্বে পরিণত হয়, যা তার বিপরীতে প্রতিতত্ত্বের জন্ম দেয়। আবার শুরু হয় একই প্রক্রিয়া এবং এভাবে তা চলতেই থাকে।

কাজেই 'দ্বন্দ্বের নীতি' অনুযায়ী তত্ত্বের বিপরীতে শুধু প্রতিতত্ত্ব তৈরি হয় না, বরং এই দুইয়ের মিশ্রণে এক সমন্বয় (synthesis) তৈরি হয়, যার মধ্যে ওই দুইয়েরই উপস্থিতি থাকে। তারপর সেই সমন্বয় থেকেই আবার একটি 'বিপরীত' বা 'প্রতিতত্ত্ব'-এর জন্ম হয়, সেখান থেকে জন্ম নেয় নতুন আরেক সমন্বয়। এভাবে চক্র চলতে থাকে। অর্থাৎ মার্ক্সবাদ চিরন্তন রূপান্তরের কথা বলে।

ক্রমাগত রূপান্তরের বিশ্বাসের কারণে মার্ক্সবাদের পক্ষে স্থায়ী মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাদের অবস্থান থেকে স্থায়ী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। যারা সমসাময়িক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিছু মূল্যবোধ গ্রহণ করে, মার্ক্সবাদীদের মতে তারা আসলে অবাস্তবকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। যদি সবকিছু ক্রমপরিবর্তনশীল হয়, তাহলে কোনোকিছুর সংরক্ষণের কথা বলা নির্বুদ্ধিতা।

মার্ক্সবাদ তত্ত্ব-প্রতিতত্ত্বের দ্বন্দ্বের নীতিকে মানব ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এবং এখান থেকেই শ্রেণি সংগ্রামের ধারণা এসেছে। সমাজের ক্ষেত্রে এই দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব প্রয়োগ করে মার্ক্সবাদ বলে, সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে কমিউনিসম অন্য সব ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত। রাজতন্ত্রে একদিকে থাকে রাজপরিবার আর তাদের ঘনিষ্ঠ অভিজাত শ্রেণি, অন্যদিকে থাকে প্রজারা। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে সমন্বয় বা সিনথেসিস হিসেবে তৈরি হয় সামন্ততন্ত্র নামে নতুন এক ব্যবস্থা। সামন্ততন্ত্রেও দুটি বিপরীত শ্রেণি থাকে। একদিকে ভূমিমালিক বা জমিদার শ্রেণি, অন্যদিকে কৃষক শ্রেণি। এই দুই শ্রেণির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়। এর মধ্য থেকে সমন্বয় বা সিনথেসিস হিসেবে জন্ম হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণি থাকে। একদিকে পুঁজিবাদীরা, অন্যদিকে শ্রমিক। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে নতুন এক সিনথেসিস, নতুন এক ব্যবস্থার জন্ম হবে, যার নাম কমিউনিসম। তবে পার্থক্য হলো, কমিউনিসমে শুধু একটা শ্রেণিই থাকবে—শ্রমিক শ্রেণি।

অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে মার্ক্স পুঁজিবাদের অবধারিত পতনের কথা বলল। পুঁজিবাদের আবির্ভাবের সময় সামন্তবাদকে সমর্থন করা শ্রেণি যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল, তেমনি পুঁজিবাদকে সমর্থন করা শ্রেণিও ধ্বংস হয়ে যাবে একসময়। রাজতন্ত্র এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছিল, কারণ তারা নিজেদের মধ্যে সাংঘর্ষিকতার কিছু উপাদান ধারণ করত। একইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একসময় এর বিপরীত বা এর সাথে সাংঘর্ষিক কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় পরিণত হবে, শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের পতন হবে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেটিও একটি 'বিপরীত' বা 'প্রতিতত্ত্ব' (antithesis)-এর জন্ম দেওয়ার কথা। সেই বিপরীতের সাথে সংঘাতে একসময় পতন হবার কথা কমিউনিস্ট ব্যবস্থার। কিন্তু মার্ক্সবাদ মনে করে, কমিউনিস্ট ব্যবস্থার পতন হবে না। এই অবস্থান তাদের নিজেদের নীতির সাথেই সাংঘর্ষিক।

'দ্বন্দ্বের নীতি' কি নতুন এই সমাজব্যবস্থা গঠনের পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে? কমিউনিস্ট ব্যবস্থা কি বিপরীতের জন্ম দেবে না?

নাকি দুই দ্বান্দ্বিক শক্তির সংঘাতে কমিউনিস্ট ব্যবস্থাও ধ্বংস হয়ে নতুন কোনো সমন্বয়, নতুন কোনো ব্যবস্থা তৈরি হবে?

এছাড়া মার্ক্সবাদের মতে, সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধেরও বিবর্তন ঘটে। প্রত্যেক নতুন সমন্বয় বা সিনথেসিস আগের চেয়ে উত্তম সমাজব্যবস্থার জন্ম দেয়। রাজতন্ত্রের চেয়ে সামন্ততন্ত্র উত্তম, সামন্ততন্ত্রের চেয়ে পুঁজিবাদ উত্তম এবং সবশেষে পুঁজিবাদের চেয়ে কমিউনিসম উত্তম। প্রত্যেক নতুন ব্যবস্থা তার পূর্বসূরির চেয়ে উত্তম—কমিউনিসমের প্রচারণাকারীরা এই দাবিটি খুব জোরেশোরে প্রচার করেন। অনেক সরলমনা মানুষ বিশ্বাসও করে বসেন এই প্রোপাগান্ডা। মনে করেন, আগে যা ছিল তার চেয়ে পরে যা আসে, তা সবসময় উত্তম। আর তাই কমিউনিসমের জন্য কাজ করার মাধ্যমে তারা আগামীর এমন এক পৃথিবীর জন্য কাজ করছেন, যা আজকের পৃথিবীর চেয়ে ভালো হবে।[5]

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, মার্ক্সবাদ বাস্তবতার ওপর গড়ে ওঠেনি, বরং এটি গড়ে উঠেছে মতাদর্শিক বিশ্বাসের ওপর। ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং তথ্য-উপাত্তের সাথে এই মতাদর্শের কোনো সম্পর্ক নেই। ফিকটে আর হেগেলের দর্শনে 'দ্বন্দ্বের নীতি' শুরু হয়েছিল নিছক একটা তত্ত্ব হিসেবে। বাস্তব তথ্য-উপাত্ত বা পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই নীতি প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু মার্ক্স এই নীতিকে নিয়ে জুড়ে দিলো ইতিহাসের ওপর। আর তা করতে গিয়ে উপেক্ষা করে বসল অর্থনীতি ছাড়া মানবসমাজের বাকি সব উপাদান আর অক্ষকে। নিঃসন্দেহে অর্থনীতি মানব ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু কেবল অর্থনীতি মানবসমাজের সম্পূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

তারপর মার্ক্স কী করেছে, দেখুন। সমাজিক বিকাশের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বাকি সব জাতি, গোষ্ঠী ও সমাজকে বাদ দিয়ে মার্ক্স তার বিশ্লেষণের কেন্দ্র বানিয়েছে কেবল ইউরোপ ও ইউরোপের অধিবাসীদের ইতিহাসকে। আবার অল্প কিছু চলক এবং ইতিহাসের নির্দিষ্ট কিছু পর্যায়ের দিকে মনোযোগ দিয়ে ইউরোপীয়দের ইতিহাসেরও যে ছবিটা সে এঁকেছে, তা অত্যন্ত সরলীকৃত।

শত শত বছর ধরে, কোটি কোটি মানুষের জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছে অসংখ্য প্রভাবক ও চলক। একটি নির্দিষ্ট সমাজ ও স্থানে বসবাস করা সীমিত আয়ুর একজন মানুষ এগুলোর বাস্তবতা ও ব্যাপ্তি কীভাবে বুঝবে? এই জটিল এবং বহুমাত্রিক ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টাও অবশ্য মার্ক্স করেনি। বাকি সব দিককে অগ্রাহ্য করে সে কেবল একটি দিক আর একটি সমাজের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। আর এর ভিত্তিতেই উপসংহার টেনে বলেছে—যা কিছু পরে এসেছে, অবশ্যই তা আগে যা এসেছে, তার চেয়ে সব দিক থেকে ভালো। কিন্তু তারপর মার্ক্স নিজের ব্যবহৃত নীতিতেই স্থির থাকতে পারেনি। থাকার চেষ্টাও করেনি। যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে ইতিহাসকে সে ব্যাখ্যা করেছে, কমিউনিসমে পৌঁছা মাত্র হঠাৎ সেই প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দিচ্ছে সে নিজেই। কিন্তু কেন এই প্রক্রিয়া বন্ধ হবে? কেন এই সময়ে? এই প্রক্রিয়া কেন কমিউনিসমের চেয়ে উত্তম কোনো ব্যবস্থার দিকে মানবজাতিকে নিয়ে যাবে না? মার্ক্সবাদের গোড়াতেই অসংলগ্নতা। এই মতবাদের ভিত্তি স্রেফ খেয়ালখুশি।

তবে খামখেয়ালিপনা সত্ত্বেও স্থায়ী মূল্যবোধের ব্যাপারে মার্ক্সবাদের অস্বীকৃতি, সমর্থকদের পাশাপাশি মার্ক্সবাদের বিরোধীকারীদের চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে। যা কিছু অতীতের তা পরিত্যাজ্য, যা নতুন তা সবসময় বরণীয়—আজ ইউরোপ ও অ্যামেরিকার এমন অনেকেই এই চিন্তা গ্রহণ করে নিয়েছে; যারা মার্ক্সবাদের বিরোধিতা করে। প্রগতি আর নিরন্তর রূপান্তরের ব্যাপারে মার্ক্সবাদের বিশ্বাস তাদের মতাদর্শিক ভিত্তির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, যেমনটা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। এ মনোভাব মূলত খেয়ালখুশি আর কামনাবাসনা বাস্তবায়নের পথে সব বাধা-নিষেধকে সরিয়ে ফেলা এবং নৈতিকতাসহ সব ক্ষেত্রে অতীতের শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে উপহাস করার বাতিক।

নিরন্তর রূপান্তর আর অবাধ প্রগতির স্লোগান আসলে যা ইচ্ছে তাই করার অজুহাত। বিশেষ করে, এই স্লোগানের আড়ালে 'রাষ্ট্র' বা সরকার যা ইচ্ছে, তা-ই করতে পারে। এই অজুহাতে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারে সব স্থায়ী মাপকাঠি আর মূল্যবোধ। যখন স্থায়ী কোনো মূল্যবোধ থাকে না, অধিকার থাকে না, সবকিছু যখন ক্রমপরিবর্তনশীল, মানুষ তখন কোথায় আশ্রয় খুঁজবে?

পরিবর্তন আর প্রগতির স্লোগানের আড়ালে একদিকে সরকার জনগণের সাথে যা ইচ্ছে, তা-ই করে। অন্যদিকে তারা জনগণকে উৎসাহিত করে কামনাবাসনা আর শারীরিক আনন্দে মেতে উঠতে, যাতে সাময়িক সুখের নেশায় মজে নিজের অধিকার, মূল্যবোধ

আর স্বাধীনতাকে ভুলে থাকে মানুষ। এই উন্মত্ততা একদিকে জান্তব কামনা আর লোভের বৈধতা দেয়, অন্যদিকে লাইসেন্স দেয় পূর্ণ একনায়কতন্ত্রের। একটার বিনিময়ে আরেকটা। এই চুক্তি সম্পাদিত হয় দুই পক্ষ; নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে। এই জঘন্য ব্যবস্থার বিরোধিতার বদলে মার্ক্সবাদ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাধ্যমে এর 'দার্শনিক' ভিত্তি তৈরি করে। অথচ এই মার্ক্সবাদই বলে, ধর্ম নাকি জনগণের আফিম! ধর্মের স্থায়ী মূল্যবোধ নাকি শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার!

***

ক্রমপরিবর্তনশীল খেয়ালখুশির অনুসরণ কেবল মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে না, বরং তা প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের জন্যও হুমকি। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের স্থায়ী বাস্তবতা ও অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধগুলো নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সমাজের গতিশীল থাকাকে নিশ্চিত করে। মানুষের চিন্তা এবং কাজকে নিরাপদ রাখে খেয়ালখুশি থেকে তৈরি বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে।

এই বৈশিষ্ট্য ইসলামি চিন্তা ও সমাজকে ওই ধরনের উন্মত্ততা থেকে রক্ষা করে, যা মার্ক্সবাদী চিন্তা এবং সমাজকে আজ গ্রাস করেছে। পশ্চিমা বিশ্বের বিশাল একটা অংশ ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থান থেকে মার্ক্সবাদের বিরোধিতা করে। কিন্তু পরিবর্তন আর প্রগতির বিশ্বাসের ফলে তৈরি- হওয়া -অসুখ আক্রান্ত করেছে তাদেরকেও। যেদিন থেকে পশ্চিমা চিন্তা ও সমাজ বিশ্বাসের নোঙর থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে, সেইদিন থেকেই এই উন্মত্ততা তাদের মনে বাসা বেঁধেছে।

বিশ্বাস ও মূল্যবোধের স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্য মুসলিম বিবেক এবং সমাজে প্রশান্তির অনুভূতি তৈরি করে। এই অনুভূতি জন্ম নেয় মজবুত কাঠামো আর নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে। একজন মুসলিম জানে—তার প্রতিটি পদক্ষেপ এক নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। সে জানে—তার জীবনের গতি যুক্ত আছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাথে। সে বোঝে—তার জীবন ও কাজগুলোর অর্থ আছে। মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী বিকাশ ও আত্মিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয় সে।

ইসলামি মূল্যবোধসমূহ স্থায়ী হবার অর্থ হলো—এটি সমাজ ও শাসনের ক্ষেত্রে এমন কিছু নীতিমালা দেয়, যা শাসক ও জনগণন, উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাসক চাইলেই যেকোনো আইন বানিয়ে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। প্রত্যেক মুসলিমের আল্লাহপ্রদত্ত কিছু মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। স্বাধীনতা আছে। এই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কর্তৃত্ব কোনো শাসক কিংবা বিচারকের নেই। সব মুসলিম শারীআর নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য। কোনো শাসকের অধিকার নেই ইসলামের মৌলিক উপাদান এবং মূল্যবোধগুলো বদলানোর। তাদের অধিকার নেই জুলুম আর লুটপাট ভুলিয়ে রাখতে কামনাবাসনা আর শারীরিক সুখের নেশার দিকে মানুষকে প্রলুব্ধ করার।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অনুযায়ী মানুষের জীবনে সম্ভাব্য অবস্থান দুটো—হিদায়াত অথবা গোমরাহি, আলো অথবা অন্ধকার, হক অথবা বাতিল, আল্লাহর আনুগত্য অথবা খেয়ালখুশির আনুগত্য, ইসলাম অথবা জাহিলিয়াত, ঈমান অথবা কুফর। প্রত্যেক সময়, স্থান এবং পাত্রের জন্য এ কথা সত্য। বিচ্যুতির ধরন অসংখ্য হতে পারে। অন্ধকারের থাকতে পারে নানা সংস্করণ। বাতিলের রূপ অনেক হতে পারে। তৈরি হতে পারে খেয়ালখুশির অনুসরণের নতুন নতুন পদ্ধতি। জাহিলিয়াতের কাঠামো বদলাতে পারে, কুফরের চেহারা বদলাতে পারে—কিন্তু এই মৌলিক সত্য অপরিবর্তিত থাকে। মানুষ হয় পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম অনুযায়ী জীবনযাপন করে অথবা জাহিলিয়াতের অন্ধকারে খেয়ালখুশি, কামনাবাসনা, বিচ্যুতি ও কুফর অনুযায়ী জীবনযাপন করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

> নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৯)

> আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে, কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আল ইমরান, ৩ : ৮৫)

> অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী থাকে? (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩২)
>
> অতঃপর (হে নবি!) আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন। আর যারা জানে না, তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৮)
>
> আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। (সূরা আনআম, ৬ : ১৫৩)
>
> যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক; তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করেছে, তাদের অভিভাবক হলো তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৫৭)
>
> আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৪)
>
> তবে কি তারা জাহিলিয়াতের আইন বিধান চায়? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে? (সূরা মায়িদা, ৫ : ৫০)
>
> অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাকো... (সূরা নিসা, ৪ : ৫৯)

ইসলামি জীবনব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে চিন্তা, ওয়ার্ল্ডভিউ, কর্ম, সমাজ ও শাসন মহান আল্লাহর নির্ধারিত সুস্পষ্ট সীমানার ভেতরে প্রাণবন্তভাবে চলাচল করতে পারে। মানুষ সুস্থ বিকাশে সাড়া দিতে পারে তখন।

স্থিতিশীলতার কারণে ইসলামি চিন্তাধারা আত্মায় মজবুতভাবে গেঁথে যায়। দ্বীনের তৈরি কাঠামোর সাহায্যে মুসলিম সমাজ দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই কাঠামোতে সুযোগ থাকে বিভিন্ন চিন্তা, পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক বিকাশ ও অগ্রগতির। খ্রিষ্টীয় চার্চের মতো ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সমাজকে লোহার খাঁচায় বন্দি করে না। আবার আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মতো সমাজকে সব শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, যার ফলে মানুষ মহাকাশে এলোমেলো ছুটে চলা ধূমকেতু কিংবা আতঙ্কিত ছত্রভঙ্গ পশুর মতো হয়ে যায়। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস এই ছত্রভঙ্গ ছুটোছুটির উদাহরণ।

স্থিতিশীলতার এই বৈশিষ্ট্যই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে মুসলিম সমাজকে সুসংহত ও শক্তিশালী রেখেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে অনেকবার মুসলিমরা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শত্রুদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল, রক্তাক্ত ও প্রকম্পিত হয়েছিল, পরাজিতও হয়েছিল সাময়িকভাবে। তবু উম্মাহ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বারবার। কিন্তু উম্মাহ যখন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর পরিপূর্ণতা, স্থায়িত্ব এবং অপরিবর্তনীয়তার ব্যাপারে সন্দিহান হতে শুরু করল, তখনই শুরু হলো উম্মাহর সত্যিকারের দুর্বলতা এবং পতন। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে শত্রুরা ইসলামি চিন্তাকে সরিয়ে রেখে পশ্চিমা ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে আমাদের প্রলুব্ধ করল।[6]

ক্রমপরিবর্তনশীল ধ্যানধারণার পেছনে ছুটে চলা সমাজের মজবুত কোনো ভিত্তি থাকে না। মানবীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সীমিত ও অনুমাননির্ভর, প্রকৃতিগতভাবেই। তাই মানবীয় চিন্তাভাবনার ওপর গড়ে ওঠা ব্যবস্থাকে নির্ভর করতে হয় অনুমান, জল্পনাকল্পনা আর ক্রমপরিবর্তনশীল নানা তত্ত্বের ওপর। এধরনের সমাজ ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে অনুমাননির্ভর জ্ঞান অথবা ক্রমাগত বদলাতে থাকা খেয়লাখুশিকে। এই মিথ্যা ইলাহদের সাপেক্ষে সমাজ তার মূল্যবোধ আর মাপকাঠি তৈরি করে। এধরনের সমাজ বিভ্রান্ত চিন্তা, বিক্ষুব্ধ বিবেক, আর পরিশ্রান্ত, রোগাক্রান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করে এলোমেলোভাবে। কারণ এর পুরো ভিত্তি গড়ে উঠেছে ক্ষণস্থায়ী মরীচিকার ওপর। ঠিক এ ব্যাপারটাই ইউরোপের ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং পশ্চিমা সভ্যতার মাধ্যমে এই অসুস্থতা পুরো মানবজাতিকে আজ গ্রাস করেছে। পৃথিবীর সব সমাজ আজ পথ হারিয়েছে মরুপ্রান্তরে।[7]

তাই স্থায়ী মূল্যবোধ এবং মূলনীতি প্রয়োজন। আর তা আসতে হবে একটি ধ্রুব উৎস থেকে। যে উৎসের কাছে বাস্তবতার সম্পূর্ণতা স্পষ্ট। যে উৎসের জ্ঞান দৃঢ় ও পরিপূর্ণ। সব দিক ও ক্ষেত্র যার জানা। পথের কোনো বাঁক, মোড়, গর্তও যার কাছে অজানা নয়। এই মূল্যবোধ ও নীতি আসতে হবে এমন এক উৎস থেকে, যা মানবীয় অনুভূতি, অনুরাগ-বিরাগ কিংবা কামনাবাসনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না, খেয়ালখুশি অনুযায়ী যার সিদ্ধান্ত বদলায় না, যার গতকালকের সিদ্ধান্ত আজ ভুল প্রমাণিত হয় না। এমন উৎস থেকে আসা ওয়ার্ল্ডভিউ প্রতিষ্ঠিত হলে সেই নির্ধারিত কাঠামো ও সীমানার ভেতরে পরিবর্তন, বিকাশ, উন্নতি এবং প্রগতিতে সমস্যা থাকে না। নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথের চালিত হবার কারণে এ সবই তখন নিরাপদ, স্বাভাবিক এবং কাম্য হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে গতি ও পরিবর্তন হয় আলোকিত এবং সুবিন্যস্ত, উদ্দেশ্য হয় মহৎ আর অগ্রগতি হয় দৃঢ়, দৃপ্ত এবং ঋজু পদক্ষেপে। সেই ওয়ার্ল্ডভিউ মানবসমাজের জন্য একটি স্থিতিশীল, অর্থবহ এবং সংগতিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা দেয়।

ইসলামি সমাজ লোহার খাঁচায় আটকে থাকা জড়াবস্থার নাম নয়। নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথের গতির অর্থ স্থবিরতা নয়। গতি মহাবিশ্বের একটি মৌলিক নীতি। মহাবিশ্ব স্থবির কিংবা স্থির হয়ে থাকে না;+ বরং তা সবসময় চলছে, বদলাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে তার বিকাশ ঘটে। তবে তা ঘটে কিছু স্থায়ী বাস্তবতা বা নিয়মের অধীনের।

পশ্চিমা চিন্তা শর্তহীন প্রগতির কথা বলে, যেখানে নির্দিষ্ট কোনো নীতি নেই। এধরনের চিন্তার জন্ম হয়েছে এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে, যা নিয়ে এরইমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার গভীরে লুকিয়ে আছে ধর্মের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ গেঁথে আছে তাদের সব চিন্তা, মতবাদ, দর্শন এবং ওয়ার্ল্ডভিউয়ের কেন্দ্রে। তাই ইসলামের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দর্শন ও চিন্তার পদ্ধতি প্রয়োগ করা অথবা ইসলাম কিংবা ইসলামি ইতিহাস নিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে এগুলোর সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা একেবারেই ভুল। আমাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিমের চিন্তা থেকে কিছু কিছু জিনিস গ্রহণ করেন। কেউ হয়তো চিন্তার পদ্ধতি গ্রহণ করেন, কেউ হয়তো তাদের কোনো কোনো উপসংহার গ্রহণ করে ফেলেন, আবার কেউ কেউ হয়তো কয়েকশ পৃষ্ঠার বই থেকে কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে নেওয়ার মতো করে কুড়িয়ে কুড়িয়ে কিছু উপাদান নেন। তারপর তারা এগুলোকে ইসলাম, ইসলামি চিন্তা, সমাজ এবং ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে মিশিয়ে ফেলেন। এটা স্পষ্ট অজ্ঞতা। আর একে 'পান্ডিত্য' বলা ঔদ্ধত্য।

মুহাম্মাদ আসাদ (লিওপল্ড ওয়েইস) তাঁর Islam at the Crossroads বইতে বলেছেন,

> ইতিহাস বলে সমাজ ও সভ্যতাগুলো জীবিত প্রাণীর মতো। প্রাণ যেমন জন্ম, যৌবন, পরিণত বয়স, বার্ধক্যের ক্ষয় আর মৃত্যুর মতো বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, ঠিক একই ব্যাপারটা ঘটে সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও। বৃক্ষ যেমন ক্ষয়ে গিয়ে একসময় ভেঙে পড়ে, তারপর ধুলোয় পরিণত হয়, তেমনি সময় ফুরিয়ে এলে মরে যায় সংস্কৃতিগুলোও। তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় নতুন, তরতাজা কোনো আগন্তুকের জন্য।
>
> একথা কি ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? আপাতভাবে তা-ই মনে হয়। ইসলামি সংস্কৃতির উত্থান ছিল অবিশ্বাস্য, তারপর এর বিকাশ ঘটেছে। ইসলাম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে মহান অর্জন আর আত্মত্যাগে। অসংখ্য জাতিকে ইসলাম বদলে দিয়েছে, পালটে দিয়েছে পৃথিবীর চেহারা। কিন্তু একসময় ইসলাম নিশ্চল, স্থবির হয়ে গেছে। তারপর পরিণত হয়েছে নিছক ফাঁকা বুলিতে। এখন আমরা ইসলামের চূড়ান্ত অবনতি আর ক্ষয় দেখছি...
>
> আপাতদৃষ্টিতে এমন মনে হতেই পারে। কিন্তু এটাই কি বাস্তবতার পূর্ণ চিত্র?
>
> আমরা যদি নিছক আরেকটি সংস্কৃতি, মানুষের চিন্তা ও কর্মের আরেকটি সমন্বয় হিসেবে না দেখে, ইসলামকে মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান হিসেবে দেখি; যে বিধান সব যুগ, সব স্থানের জন্য প্রযোজ্য—তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে বাধ্য। ইসলামি সংস্কৃতি যদি ওহির অনুসরণের ফসল হয়, তাহলে কোনোভাবেই অন্য সংস্কৃতিগুলোর মতো একে স্থান ও কালের শেকলে বাঁধা যাবে না। কোনো অঞ্চল বা যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না একে।
>
> আমাদের কাছে যেটাকে ইসলামের ক্ষয় মনে হচ্ছে, আসলে সেটা আমাদের নিজেদের অন্তরের মৃত্যু আর শূন্যতা। আমাদের অলস, স্থবির হৃদয়গুলো চিরন্তনের আহ্বান শুনতে পায় না। মানবজাতি ইসলামকে অতিক্রম করে গেছে,

ইসলামের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে—এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আধুনিক মানুষ নৈতিকতার এমন কোনো কাঠামো তৈরি করতে পারেনি, যা ইসলামের চেয়ে উত্তম। আধুনিক সভ্যতা 'উম্মাহ'-এর মতো ভ্রাতৃত্ববোধের বাস্তবসম্মত কোনো ধারণা পেশ করতে পারেনি। আধুনিক মানুষ এমন কোনো সামাজিক কাঠামো তৈরি করতে পারেনি, যা ইসলামের মতো সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাতকে ন্যূনতম মাত্রায় রাখতে পারে। আধুনিক সভ্যতা মানুষের সম্মান, নিরাপত্তার অনুভূতি, আত্মিক আশাবাদ এবং অবশ্যই মানুষের সুখ বাড়াতে পারেনি।

প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনিক সভ্যতার অর্জন ইসলামের সামনে ম্লান হয়ে যায়। তাহলে কীসের ভিত্তিতে বলা হবে, ইসলাম সেকেলে? ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম। আর ধর্ম ও ধার্মিকতাকে আজ বেমানান, সেকেলে মনে করা হয়, এটাই কী কারণ? কারণ হিসেবে এটা কি যথেষ্ট?

আমরা তো দেখি ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলাম যে জীবনব্যবস্থা বা দ্বীন দিয়েছে, তা মানুষের বানানো যেকোনো ব্যবস্থার চেয়ে বেশি মজবুত, পরিপূর্ণ এবং মানবপ্রকৃতির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাজারো প্রস্তাবনা আর সংস্কারের পরও এর ধারেকাছে পৌঁছাতে পারেনি মানবরচিত কোনো ব্যবস্থা। ইসলামে এই অনন্য সাফল্য কি এই আলোকিত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে জোরালো যুক্তি নয়?

ইসলামি সভ্যতার অর্জনগুলোর দ্বারা ইসলাম সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ এই অর্জনগুলো বাস্তবায়িত হবার বহু আগেই ইসলাম এগুলোকে কাম্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। একইভাবে মানবীয় বিকাশের ত্রুটি, বিচ্যুতি আর চোরাবালিগুলোও ইসলামকে সঠিক প্রমাণ করে। মানুষ এই ভুলগুলোকে চিনতে পারার বহু আগেই ইসলাম মানবজাতিকে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছিল। বিশ্বাসের কথা সরিয়ে রেখে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিচার করলেও ইসলামের বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা অনুসরণের যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়।

অনেক মুসলিম মনে করে ইসলামের 'সংস্কার' প্রয়োজন। না ইসলামের কোনো সংস্কারের প্রয়োজন নেই। ইসলাম নিখুঁত। সংস্কার দরকার ইসলাম নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর মনোভাবের। সংস্কার দরকার আমাদের স্থবিরতা, অলসতা, অহমিকা আর অদূরদর্শিতার। ত্রুটি আমাদের মধ্যে, ইসলামের মধ্যে নয়।

আত্মিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামের 'উন্নতি' করা সম্ভব নয়। বরং ইসলামি ধারণা অথবা ইসলামের সামাজিক শিক্ষার মধ্যে যেকোনো পরিবর্তনের অর্থ হলো এর মধ্যে বিজাতীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটানো। যা বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষাকে নষ্ট করবে, ধ্বংসাত্মক হবে এবং একসময় গভীর অনুশোচনার জন্ম দেবে। পরিবর্তন প্রয়োজন, তবে সেই পরিবর্তন প্রয়োজন আমাদের নিজেদের মধ্যে। পরিবর্তন হতে হবে ইসলামের দিকে, ইসলাম থেকে সরে গিয়ে নয়।[8]

ইসলামের সাথে পশ্চিমা সেক্যুলার চিন্তার মিশ্রণের কারণে ক্ষতি শুধু মুসলিমদের হবে না, এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পুরো মানবজাতি। এধরনের মিশ্রণের অর্থ হবে মানবজাতির সামনে থাকা একমাত্র আসমানি দিকনির্দেশনাকে মানুষের বানানো দুর্বল আর বিষাক্ত চিন্তা দিয়ে দূষিত করে ফেলা। মানুষ আজ এলোমেলো চিন্তার দমকা বাতাসে উদ্দেশ্যহীনভাবে কাঁপছে। জলে ও স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের অপরাধের ফলে। দিকভ্রান্ত মানবজাতির সামনে ইসলামই একমাত্র দৃঢ়, মজবুত হাতল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই বিশুদ্ধ, নিখুঁত দিকনির্দেশনা ছাড়া মানুষের সামনে আর কোনো আশ্রয় নেই। প্রগতি আর সংস্কারের নামে, 'মধ্যযুগের সেকেলে ঐতিহ্য' ছুড়ে ফেলার নামে কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে যারা মানবজাতির এই শেষ আশ্রয়কে নষ্ট করতে চায়, তারাই মানবজাতির প্রকৃত শত্রু। শুধু মুসলিম নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির উচিত এদের প্রত্যাখ্যান করা এবং ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলা।

তারা প্রগতিশীলতা বনাম প্রতিক্রিয়াশীলতার আলাপ করে। বাস্তবতা হলো তারা আজও অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিকদের ফেলে আসা বুদ্ধিবৃত্তিক খড়কুটো কুড়িয়ে খাচ্ছে। তারা এখনো ঠিকঠাক বিংশ শতাব্দীতেই এসে পৌঁছাতে পারেনি। তারা জানেও না যে, মার্ক্সবাদ, ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিসম আর ডারউইনবাদসহ যেসব মতাদর্শের পূজো তারা করে, খোদ ইউরোপেই সেগুলোর বিপরীতে বিভিন্ন ধ্যানধারণার আবির্ভাব ঘটে গেছে বহু আগেই। নিজেদের প্রগতিশীল দাবি করলেও তারাই

আসলে প্রতিক্রিয়াশীল। ইসলামের সত্যের প্রতি ফিরে যাওয়ার দায়িত্বকে উপলব্ধি করলেই কেবল সত্যিকারের প্রগতি সম্ভব। তিন শতাব্দী ধরে মানবজাতি বিভ্রান্ত। অনেক ধোঁকা, ধাক্কা আর কষ্টের পর মানুষ আজ ক্লান্ত। মানবজাতির প্রয়োজন ইসলামের ছায়াতলে নিশ্চয়তা, সান্ত্বনা আর আত্মিক প্রশান্তির।

ঐতিহাসিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে পশ্চিমা চিন্তা যে বিপর্যয়গুলোর সম্মুখীন হয়েছে, যেগুলোর কারণে তারা বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে আজও ঘুরে ফিরছে, মহান আল্লাহ তা থেকে আমাদের হেফাযত করেছেন। আজ যদি আমরা নিজেরাই বিশুদ্ধ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ছুড়ে ফেলে, সেই গোলকধাঁধায় ঝাঁপিয়ে পড়ি, তবে তা হবে সবচেয়ে বড় মূর্খতা। সবচেয়ে জঘন্য নির্বুদ্ধিতা। পুরো মানবজাতিকে এধরনের নির্বুদ্ধিতার মাশুল দিতে হবে। কারণ এর ফলে আমরা সেই বিশুদ্ধ উৎসকে হারিয়ে ফেলব, যার মাধ্যমে মানবজাতি আজকের এই দুর্দশা আর ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়ে প্রশান্তি ও মুক্তি খুঁজে পেতে পারে।

মানবজাতি আজ অত্যন্ত গুরুতর বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এই বিপর্যয় থেকে মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখানোর দায়িত্ব আমাদের, মুসলিমদের। আমাদের উপলব্ধি করা দরকার এই দায়িত্বের ভার ও গুরুত্ব।

---

[1] দ্রষ্টব্য—সূরা হিজর, ১৫ : ২৯। (অনুবাদক)

[2] দ্রষ্টব্য—সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৫। (অনুবাদক)

[3] দেখুন—Julian Huxley: The Challenges of Modern Science to Human Action and Belief, Chatto and Windus, London, 1931.

[4] ডারউইনের অবস্থানের সমসাময়িক সমালোচনার জন্য দেখতে পারেন :

Behe, Michael J. Darwin's black box: The biochemical challenge to evolution. (1996), Meyer, Stephen C. Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design. (2009) Behe, Michael J. Darwin devolves: The new science about DNA that challenges evolution. (2019). (অনুবাদক)

[5] মুহাম্মাদ আল-বাহি, Modern Islamic thought and its connection with Western colonialism (اَلْفِكْـــرُ الْإِسْلَامِيُّ الْحَدِيْثُ وَصِلَتُهُ بِالْاِسْتِعْمَارِ الْغَرْبِيِّ), পৃষ্ঠা ৩১১-৩১৫।

[6] বিস্তারিত জানতে দেখুন—মুহাম্মাদ কুতুবের ‘হাল নাহনু মুসলিমুন?’ (هَلْ نَحْنُ مُسْلِمُوْنَ؟) (আমরা কি মুসলমান?—,–নামে বাংলায় অনূদিত।) ~অনুবাদক

[7] এই লেখকের আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাদারা (اَلْإِسْلَامُ وَمُشْكِلَاتُ الْحَضَارَةِ)—দ্রষ্টব্য।

[8] মুহাম্মাদ আসাদ, Islam at the Crossroads (১৯৫৫), আশরাফ পাবলিকেশনস, লাহোর, পৃ. ১৫ -১৫৫। ('সংঘাতের মুখে ইসলাম' নামে বাংলায় অনূদিত।) ~অনুবাদক